কয়েকটি নাটক নিয়ে আলোচনা

তুলসী লাহিড়ী। নট, নাট্যকার এবং সমাজ-পরিপার্শ্ব ও রাজনীতি সচেতন একজন স্রষ্টা। নাট্যচিন্তা নির্মাণে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতীত। বিভিন্নভাবে নানা সময়ে তাঁর নাট্যচিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। তুলসী লাহিড়ীর লেখায় সব সময় যে মৌলিক তত্ত্বভাবনা প্রকাশিত হয়েছে এমন নয়, কিন্তু তাঁর জীবনের একটা বড়ো অংশ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই সুবাদে রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় করেই তাঁর জীবন আলোড়িত হয়েছে। তাঁর সমাজভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। তুলসী লাহিড়ীর লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর সেই ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে এখানে একটা ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করব আমরা।

দুঃখীর ইমান

পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের নাট্যবস্তু ভাবনা এবং রঙ্গমঞ্চ পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছিল বিজন ভট্টাচার্যের '*নবান্ন*'। '*নবান্ন*'-র আগেও এইরকম প্রয়াস সামান্য হলেও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু '*নবান্ন*' দর্শককে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল। তুলসীবাবু পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের পরিধির মধ্যে থেকেই বাংলার গ্রামকে তুলে আনলেন রঙ্গমঞ্চে। অহীন্দ্র চৌধুরীর '*নিজেরে হারায়ে খুঁজি*' গ্রন্থে দেখা যায় '*দুঃখীর ইমান*' মঞ্চস্থ করার প্রয়াস চলছিল। শিশিরকুমার ভাদুড়ীও সম্ভবত রঙ্গমঞ্চের দুরবস্থা দূর করার মানসে নতুন নাটকের খোঁজ করেছিলেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও একটু ব্যতিক্রমী কিছু পরিবেশন করা তাঁর লক্ষ্য ছিল। তুলসীবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে তিনি '*দুঃখীর ইমান*'কে জায়গা দিলেন। '*দুঃখীর ইমান*' পঞ্চাশের মন্বন্তরকে আশ্রয় করেছিল। বলা বাহুল্য দুর্ভিক্ষের যে ভয়াবহ স্মৃতি বাঙালির চিত্তকে অধিকার করেছিল, তার বাস্তব রূপ এই নাটকে চিত্রিত হয়েছে। বাংলার গায়ক, অভিনেতা, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, কবি এই দুর্ভিক্ষের চিত্ররচনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তুলসী লাহিড়ীও তাঁর ব্যতিক্রম নন। তিনি জমিদার। জমিদারি ব্যবস্থার টানটোন তাঁর জানা ছিল। আইনজ্ঞ তুলসী লাহিড়ী জানতেন কীভাবে আইনের ফাঁদে কৃষককুল জড়িয়ে গিয়েছিল। দীনবন্ধু থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, লালবিহারী দে থেকে বিজন ভট্টাচার্য সকলেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত কৃষককুলের দুর্ভাগ্যের কথা জানতেন। তুলসীবাবু কিছুকাল ওকালতিও করেছিলেন। সুতরাং অশিক্ষিত কৃষককুল কীভাবে পুলিশ, দারোগা, জমিদার, ব্যাবসাদারদের দ্বারা নিপীড়িত হয় তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলসীবাবুর থাকাই স্বাভাবিক। দীনবন্ধুর নাটকে নীলকরদের আদালতি ব্যবস্থার ক্ষমতার জোরে সুযোগ গ্রহণের ছবি পাই। লক্ষণীয় বাংলা রঙ্গমঞ্চে বিচারদৃশ্য, আদালতগৃহ, উকিল, বিচারক, বাদী বিবাদীর সওয়াল-জবাব বেশ আয়োজন করে দেখানোর ব্যবস্থা

ছিল। এসব দৃশ্যের সত্যমিথ্যার যে বিচিত্র রূপ দেখা যেত তাতে সমগ্র সমাজের চেহারাটা কখনও প্রত্যক্ষ কখনও তির্যকভাবে প্রতিফলিত হত। তুলসীবাবু আদালত গৃহচিত্র দেখাননি বটে, কিন্তু তিনি শঠ, প্রতারক, চরিত্রহীন, স্বার্থপর রঘুনাথের বাড়িতেই একটি এজলাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। পুলিশের কাছে দাগি চোর ধর্মদাসের নতুন করে চুরির বিচার এবং সাজা দেখার উপলক্ষ্যে নাটকের মুখ্য ও গৌণ চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এই দৃশ্যেই (তৃতীয় অঙ্ক) নাট্যকার তাঁর অভিপ্রেত প্রয়াসটিকে ধীরে ধীরে দারোগার জেরার পর জেরার সাহায্যে উত্তেজনাকে যেমন ধীরে ধীরে শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছেন, তেমনই সত্যের নির্মম রূপটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সর্বহারার হারানোর যখন কিছুই নেই তখন তুলসীবাবু তাঁর বিদ্রোহকে এমনই একটি প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়ে দেন, যেখানে আমরা দেখতে পাই সমাজের চোখে, আইনের চোখে যে আসামী, মানবিকতার দিক থেকে সেই নির্দোষ। পিষ্ট মানুষ মরিয়া হয়ে যখন দুই মুঠো অন্নের জন্য সব কিছু ভুলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে চালের গুদামে, তখন বঞ্চিত মানুষের আর্তনাদই স্ফুট হয়ে ওঠে।

জামালের ছেলে মৃত্যুমুখে, তার স্ত্রীর গায়ে কাপড় নেই, সারা মাস জামাল উপোসি। ধর্মদাসের মৃত পুত্রের কথা মনে পড়ে যায়। আর একজনের পুত্রের মুখে অন্ন জোগানোর জন্য সে নিতাই সা-র দোকানে সিঁদ কাটে, চাল বার করে আনে, পৌঁছে দেয় জামালের বাড়িতে। জামাল ধরা পড়ে। কিন্তু হাতকড়া লাগানোর পরও সে ধর্মদাসের নাম করে না। দুঃখের সঙ্গে ইমান যুক্ত হয়েছে—অতএব ঈশ্বরে বিশ্বাস তার অটুট। হয়তো ওই ইমানের মধ্যেই তার অস্তিত্ব। ধর্মদাসও যখন অকপটে তার চুরির কথা বলে তখন তার উক্তিতে দেখি জামালেরই কথার প্রতিধ্বনি। জামালকে প্রকৃত চোরের সন্ধান দিতে বলায় সে বলেছিল *'ইমান ছাড়িবার নই হুজুর'* আর ধর্মদাস বলে *'তোর ইমান আছে আর কারও নাই নাকি ? হুজুর হামি চুরি কচ্ছি। ফির্ হামার উপর মুসলমানের ইমান দেখায় ! হামার হরিশ্চন্দ্রের কথা নাই, হামার দাতা কর্ণের কথা নাই, শিবিরাজের কথা নাই—ইমান দেখায় হামাক'*। তুলসী লাহিড়ী এই সত্যনিষ্ঠ চাষিকে পেয়েছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতায়। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঐক্যেরও একটা সুর বাজতে থাকে ওই উক্তিতে। ধর্মদাসের উক্তিতে একটু বক্তৃতায়িত ভঙ্গি আসলে নাট্যকারেরই বহু ভাবনার একটি রেখাচিত্র।

'*দুঃখীর ইমান*' তুলসী লাহিড়ীর সর্বহারার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির চিত্র। এমনই একটা সময়ে তিনি এই নাটক রচনা করেছিলেন যখন ভারতবর্ষ দারুণ একটা ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। মন্বন্তর, ঘন ঘন মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরীণ সংকট, দুর্ভিক্ষ, নৌবিদ্রোহ, দেশব্যাপী গণআন্দোলনের তীব্র জোয়ার, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস, কংগ্রেসি আন্দোলনের একটা বিরাট পর্বের অন্তিম পরীক্ষা অন্যদিকে মধ্যবিত্তের নতুন পথের সন্ধান—দেশব্যাপী এই আলোড়ন মানুষকে নানাদিক থেকে অধৈর্য করে তুলছিল। সচেতন শিল্পী তুলসীবাবু সিনেমা শিল্পের প্রতি আগ্রহ আর ধরে

Scanned by CamScanner

রাখতে পারলেন না। সিনেমা এবং নাটকের ক্ষেত্রে কোনো 'ব্রেক থ্রু'-ও ঘটছিল না। (*'নবান্ন'* অবশ্যই এর ব্যতিক্রম)। *'দুঃখীর ইমান'* নাটকের আরম্ভে তিনি একটি দীর্ঘ ভূমিকা জুড়ে দিয়েছেন। বস্তুত মঞ্চ নির্দেশনার বিবৃতির মধ্যে নাটকের প্রেক্ষাপট নিয়ে এরকম বিশ্লেষণাত্মক রচনাই তুলসীবাবুর শিল্পীসত্তাকে চিনিয়ে দেয়। চোরাকারবার, বেকারিত্ব, দেশকর্মীর কারাবরণ, মুনাফাবাজির মধ্যে দেশের যুবশক্তি বিভ্রান্ত। এমনকী লোভের শিকার হয়ে আত্মবিক্রয় করেছিল সেদিন কিছু দিশেহারা মানুষ। তুলসীবাবু বলেছেন :

> আতঙ্কগ্রস্ত দেশের চরম বিপদের দিনে সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। মূর্তিমান বিশৃঙ্খলা ও বীভৎসতা মন্বন্তরের পটভূমিকায় সোনার বাংলার বুকে তাণ্ডব শুরু করিল। সৌষ্ঠব শালীনতা সদাচার সহৃদয়তা দিয়ে গড়া বাংলার সৌকুমার্যের সাজান আসর চুরমার হইয়া গেল।

এই ভাঙনের মর্মান্তিক চিত্র *'দুঃখীর ইমান'*। প্রধান চরিত্র ধর্মদাস এই ভাঙনের শিকার। তার স্ত্রী বিলাতী উপোস করে থাকে। চিড়া কোটে কিন্তু সে চিড়ায় তার অধিকার নেই। সে দিনমজুরে পরিণত হয়। জমিজমা হারিয়েছে ধর্মদাস, মিথ্যা চুরির দায়ে জেলও খেটেছে। দাগি চোর বলে চিহ্নিত সরকারি নথিপত্রে।

নাটকের বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ জীবনীগ্রন্থে সম্ভব নয়। নাট্যকারের অভিপ্রায়ের কথাই আমরা বলতে পারি। ওই ভূমিকাতেই তুলসীবাবু বলেছেন সেই সময়কে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত বলে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর কথায় 'বিপ্লবের পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও সেদিন বিপ্লব আসে নাই।' সুধী প্রধানের সাক্ষ্যে বলতে পারি *'দুঃখীর ইমান'* ১৯৪৩ সালেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা আরও জানতে পারি প্রগতি লেখকদের সমাবেশে *'দুঃখীর ইমান'*-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে তুলসীবাবু উপস্থিত ছিলেন। পরে নাটকটি একদিন পড়তে হয়। কিন্তু নাটকের শ্রেণিসংগ্রামের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলসীবাবুর ভুল ছিল বলে অনেকের মনে হয়েছিল। সেই কারণে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়নি। *'নবান্ন'* এবং *'দুঃখীর ইমান'* একই সময়ের লেখা। বস্তুত ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই এই নাটকের *'প্রথম রজনী'*র কথা পাই (১২ ডিসেম্বর)। তাহলে কি তুলসীবাবুর মনেও স্বাধীনতাপ্রাপ্তি সম্পর্কে সংশয় ছিল, যেমন ছিল এক অংশ বুদ্ধিজীবীদের ! দেশবিভাগকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন—না মেনে উপায় কী—কিন্তু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। তিনি একটি বিপ্লবই প্রত্যাশা করেছিলেন। সুশীল মজুমদার তুলসীবাবু সম্পর্কে বলেছেন, তুলসী ছিলেন বামপন্থী। কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও তুলসীবাবু মনেপ্রাণে বামপন্থীই ছিলেন। মার্কসীয় মূলতত্ত্বগুলি যে তাঁর জানা তা মাস্টারমশাই চরিত্র থেকেই বোঝা যায়। নাটকের দিক থেকে দুর্বল হলেও মাস্টারমশাই, ধর্মদাস, বিলাতীর সংলাপে মাস্টারমশাই শ্রম-উৎপাদন-বণ্টন এবং ভোগের যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন তা মার্কসবাদসম্মত। মার্কসবাদেরই সহজ সরল বাংলা ভাষ্য।

তুলসী লাহিড়ী ইতিহাসের ইঙ্গিত নিয়েই বলেছেন এই নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের মধ্যে একটা জাগরণের সূচনা দেখতে পান। বিপ্লব প্রসঙ্গে তিনি বলেন

'তাহারই আগমনের প্রতীক্ষায় অন্তর্জগতে নিপীড়িতের মনে যে পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছে তাহারই আভাস দিবার চেষ্টা এই নাটকে'। পরিবর্তনে বিশ্বাসী তুলসীবাবু। তিনি মানেন এই পরিবর্তন শিল্পেও পরিবর্তন ঘটায়। তুলসীবাবু এ-ও বুঝেছিলেন এই পরিবর্তন অন্তর্জগতের। সম্মিলিত প্রয়াসে বিদ্রোহের আগুন জ্বালানোর সামর্থ্য কৃষক প্রজা এখনও অর্জন করেনি। কিন্তু তাদের অন্তর্জগতের রোষ, ঘৃণা দেখে পুঁজিবাদী সমাজ কিছুটা নড়েচড়ে বসে। তারা কৃষকপ্রজার ছায়া দেখে চমকাচ্ছে। দারোগা বুঝতে পারে স্বভাবে 'বিনীত' চাষা আজ অভাবের তাড়নায় জেদি আর মারমুখী। ভাঙানির অভাব এবং তারই ফলে ধনী মানুষরা প্রজাদের ঠকানোর কৌশল বার করেছে। চাষি খেপে গিয়ে বলে তারা কি নোট চাটবে ? বড়ো দারোগাকে দেখি ভাঙানি বার করে দিতে। আমলাতন্ত্রের মধ্যে কি তুলসীবাবু কিছু 'সহৃদয়' মানুষকে খুঁজে পেয়েছিলেন ?

এই প্রশ্নটি গুরুতর। সুশীল মজুমদার বলেছিলেন তিনি *'দুঃখীর ইমান'* সিনেমা করতে এগিয়ে এসেছিলেন একটা বিশেষ কারণে। তুলসীবাবুর এই নাটকে জমিদার চরিত্রটির প্রতি সুশীল মজুমদারের পক্ষপাত। জমিদার মাত্রেই যে বড়ো মাছ, ছোটো মাছ দেখলেই খেয়ে ফেলে, এই জমিদার বিপুল রায় সেই প্রকৃতির নন। তাঁর প্রতি তুলসীবাবুর কোথাও যেন সহানুভূতি আছে। সুশীলবাবুর আকর্ষণ সেইখানে। সুশীলবাবু বলেননি কিন্তু তুলসীবাবু যে বড়ো দারোগাবাবুর বিচারে প্রজাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। বলা যেতে পারে জমিদার তুলসীবাবুর আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে এই বিপুল রায় চরিত্রে। দ্বিতীয়ত শ্রেণিসংগ্রামের চিত্রটা তুলসীবাবুর কাছে জল-সচল বিভাজন ছিল না। এখানে উনিশ শতকীয় আদর্শবাদের ছায়া দেখতে পাই।

কিন্তু এই নাটকের মুখ্য চরিত্র বিপুল রায় নয়। এমনকী বড়ো দারোগাও নয়। তুলসীবাবু অবশ্য ছোটো দারোগার চিত্রে 'ক্ষতিপূরণ' করে দিয়েছেন। মধ্যবিত্তের মানসিকতাকে নাট্যকার বর্জন করবেন কীভাবে ?

তুলসী লাহিড়ীর নাটকের অন্যতম প্রেরণা উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চল। গ্রামবাসীদের তিনি চিনতেন। নিজে উত্তরবঙ্গের অধিবাসী। জমিদারিতে যখন কলকাতা থেকে এসে রীতিমতো হাতে কলমে যোগ দিলেন তখন নিশ্চয়ই তিনি আরও ঘনিষ্ঠভাবে চাষি, খেতমজুর, দিনমজুরদের পরিচয় পেয়েছিলেন। সেই সূত্রে ব্যাবসাদার, জমিদার, সুদখোরদের সম্পর্কেও তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। থানা পুলিশ তো তাঁর জীবিকার সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল। তুলসী লাহিড়ী উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কতটা নিবিড়ভাবে জড়িয়েছিলেন, বাল্য কৈশোর এবং কতকটা যৌবনের দিনগুলির স্মৃতি কত উজ্জ্বল ছিল তা এই নাটকের ভাষার প্রয়োগে সবচাইতে ভালো করে জানা যায়। নাটকে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ অবশ্য নতুন নয়। দীনবন্ধু থেকেই তার শুরু। কিন্তু সম্পূর্ণ নাটকটি বাহে ভাষায় রচনা করা এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। সবিতাব্রত দত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, অভিনয়ের মহড়ার সময়েও এই নাটকের ভাষা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুঝে গিয়েছিলেন এই ভাষার শক্তি সামর্থ্য কোথায়। কেবল তাই

Scanned by CamScanner

নয় বিলাতীর দাম্পত্য জীবনের যে টুকরো দৃশ্যরূপ এই নাটকে উঠে এসেছে সেখানে চিড়ে কোটার গানের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তির প্রকাশ, ধর্মদাসের সঙ্গে নিজেদের পূর্বরাগের কাহিনির বর্ণনায় ওই অঞ্চলের গার্হস্থ্য জীবনের প্রকৃতরূপ ধরা পড়েছে। তুলসী লাহিড়ীর জীবনকথায় এই প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তিনি যথার্থই ছিলেন গ্রামজীবনের দরদি শিল্পী। শহর তাঁকে টেনেছে কিন্তু গ্রাম তাঁকে বেঁধে রেখেছিল।

'দুঃখীর ইমান' শিশিরকুমারের ভালো লেগেছিল। শিশিরকুমার উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। তিনি তুলসী লাহিড়ীকে প্রশ্ন করেছিলেন 'নাটকটি আপনি ইনস্‌পায়ার্ড হয়ে লিখেছিলেন ? না সব কিছু চিন্তা করে প্ল্যান করে লিখেছিলেন ?' তুলসী লাহিড়ী উত্তরে বলেন, 'চিন্তাও করেছি যে অবস্থায় যাদের দেখে, পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাঁদের অনেকেই এই হতভাগ্য দেশ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। যাঁরা আজও বেঁচে আছেন, তাঁরা রাত্রির সাধনা করে প্রভাতকে বরণ করে আনবেন, এই আশায় উন্মুখ হয়ে দিগন্তে চেয়ে আছি, কবে এই মেকি সভ্যতার দম্ভ দূর হবে। কবে শাসন সংরক্ষণের নামে হৃদয়হীন শোষণের অবসান হবে ?[১] এই তুলসীবাবুর নাটক রচনার নেপথ্য। যেখানে কৃষকের প্রতি ভালোবাসা আর মানবিকতাবোধ ছাড়া আর কিছু নেই। সুনীলবাবু নাটকটিকে 'জীবনকাব্য' আখ্যা দিয়েছেন।

এ কথা তো ঠিক *'দুঃখীর ইমান'* মঞ্চস্থ হওয়ার সময়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্রের মতো অভিনেতারা ছিলেন। কিন্তু গতানুগতিক ধারাকে তাঁরা ভাঙতে পারছিলেন না। পুরোনো নাটক করে করে তাঁরা হতাশায় ভুগছিলেন। শিশিরকুমার তো আলমগীর আর রঘুবীর করে করে ক্লান্ত। দর্শক সমাগম হচ্ছে না। বীরু মুখোপাধ্যায় বলেছেন "রক্ষণশীল চিন্তাধারার বাহকরা তখনও 'অভাবনীয় অভিনেতৃ সম্মেলনে' *'মিশর কুমারী'*, *'বঙ্গে বর্গী'* অভিনয় করে আসর জমাতে চাইছিলেন বা কয়েকটি সম্মান রজনীতে কিছু অর্থসাহায্য দিয়ে মঞ্চশিল্পের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছিলেন। কিন্তু এই পরিবর্তিত জনমানসকে যিনি সর্বপ্রথম শিল্পীর দূরদর্শিতায় প্রত্যক্ষ করলেন, তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর রঙ্গমঞ্চ শ্রীরঙ্গম (অধুনা বিশ্বরূপা) মঞ্চে প্রগতিশীল নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর *'দুঃখীর ইমান'* তুলে ধরলেন তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায়। *'দুঃখীর ইমান'* নাটকের বক্তব্য বা উপস্থাপনা সম্পর্কে বহু তর্কের অবকাশ থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলাদেশের সাধারণ পেশাদারি রঙ্গালয়ে এই *'দুঃখীর ইমান'* নাটকেই সর্বপ্রথম একজন শ্রমজীবী নায়কের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হল। সন্দেহাতীতভাবে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এটি একটি বৈপ্লবিক পট-পরিবর্তন, এ পরিবর্তন সূচিত হল 'নবান্ন' তথা গণনাট্যের প্রেরণায়।"[২] *'নবান্ন'* নাটককে মাইলস্টোন ধরা গেলে বলা যায়, এই সময় থেকে নাটকে একনায়কত্বের অবসান হল। এল গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনচেতনা, সমাজতান্ত্রিক ভাবনা চিন্তা, সাধারণ মানুষের ধ্যান ধারণা, সমকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র চরিত্র। বিভূতি মুখোপাধ্যায় *'দুঃখীর ইমান'*-কে এই নবধারার নাটকরূপে অভিহিত করেছেন।[৪]

'দুঃখীর ইমান'। প্রথম অভিনয় রজনী—১২ ডিসেম্বর, ১৯৪৭, বৃহস্পতিবার, শ্রীরঙ্গম মঞ্চ।

নাটকের চরিত্র	অভিনেতা ও অভিনেত্রী
ধর্মদাস	কালীপদ সরকার
রঘুনাথ	দুর্গাদাস সান্যাল
বিপুল রায়	নীতীশ মুখোপাধ্যায়
মাস্টার মহাশয়	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
জামাল	কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
বড়ো দারোগা	আদিত্য ঘোষ
ছোটো দারোগা	নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
রাম অওতার	বলাই মুখোপাধ্যায়
ভুঁইয়া	গণেশচন্দ্র শর্মা
প্রসাদ	শৈলেন সাহা
শিব ঠাকুর	সহদেব গাঙ্গুলি
হারাণ পাইক	জ্যোতি বর্মণ
দিনু চোর	বিজয় দত্ত
চৈতন্য সা	সহদেব গাঙ্গুলি
সমিতির যুবক ১ম	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সমিতির যুবক ২য়	নিমাই রায়
সমিতির যুবক ৩য়	সুনীল ঘোষ
বুদ্ধিমান	প্রবোধচন্দ্র দত্ত
বংশীধরন	কুলেশ্বর দত্ত
ট্যাপারু	সত্যেন গোস্বামী
বসিরউদ্দিন	শ্রীমতী কেতকী (ছোটো)
পাতিরাম চৌকিদার	নিমাই রায়
এরফান দফাদার	নিমাই ঘোষ
সিভিক্ গার্ড ১ম	শ্যামকমল রায়

Scanned by CamScanner

নাটকের চরিত্র	অভিনেতা ও অভিনেত্রী
সিভিক্ গার্ড ২য়	— দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
রতন	— বিমলচন্দ্র দে
গীদাল	— গণেশচন্দ্র শর্মা
প্রৌঢ় ভদ্রলোক	— ভোলানাথ শীল
চাষি	— মণীন্দ্রমোহন ভৌমিক
জনৈক যুবক	— রমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
দুখিয়া	— সুনীল ঘোষ
মনিরাম	— হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়
ভৃত্য	— নলিনী ভট্টাচার্য
বিলাতি	— শ্রীমতী লীলাবতী (করালী)
ন্যানো	— লাবণ্য
ক্ষীরোদা বৈষ্ণবী	— প্রভা

ছেঁড়া তার

'ছেঁড়া তার'-এর নায়ক রহিমুদ্দিন (রহিমুদ্দি) চাষি। ধান, পাট চাষ করে ভালোভাবেই সে সংসার করে। কিন্তু পাটচাষে এক সময়ে বারবার লোকসান যাচ্ছিল। বেশ কিছু জমি বেচে দিতে হল। অল্প জমিজমা নিয়ে সে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য হারায়। তবু অল্পে সন্তুষ্ট চাষি রহিম দুঃখকষ্টে আর পাঁচজন চাষির মতোই দিনযাপন করে। স্কুলে সে ক্লাসে প্রথম হত। বাপ ছেলের জন্য খরচপাতি করেছে। কিন্তু প্রথম হওয়া ছেলেকে শেষ পর্যন্ত স্কুল ছাড়াতে হয় বই কেনার টাকার অভাবে। চাষির ছেলে লেখাপড়া বিসর্জন দিয়ে চাষবাসেই লেগে যায়।

রহিম বিবাহিত। বিবি ফুলজান। একটি ছেলে। রহিমুদ্দিনের দাম্পত্য জীবন মধুর। সুখী পরিবার। ছেলেবেলা থেকে রহিমের শখ ছিল গানের। কিন্তু আজকে গান প্রায় ভুলে গেছে। গান শুনলে ছেলেবেলার স্মৃতি জেগে ওঠে। দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে সে স্মৃতি ডুবে যায়। রহিমের বন্ধু মহিম শহুরে। সে রহিমকে একটি এস্রাজ কিনে দেয়। রহিম মহিমের দেওয়া এস্রাজটি নিয়ে গ্রামে চলে আসে। রহিমের কথায় জানা যায় রহিমের বাবা গ্রামের মাতব্বর হাকিমুদ্দির কাছ থেকে টাকা ধার করে হজ করে এসেছিল। ঋণ শোধ করবার সামর্থ্য ছিল না বাপ করিমুদ্দির। ফলে জমিজমা চলে গেল হাকিমুদ্দির গ্রাসে। হাকিমুদ্দির নষ্টামির আরও অনেক সংবাদ পাই রহিমুদ্দির ক্ষোভ এবং স্পষ্ট কথায়। গ্রামের মানুষরা প্রায় সকলেই হাকিমুদ্দির ভয়ে ভীত। কিন্তু রহিমুদ্দি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। তার জমির ধান খেয়ে নেয় হাকিমুদ্দির গোরু। শেষমেষ সে হাকিমুদ্দির গোরুকে খোঁয়াড়ে দেয়। হাকিমুদ্দির ধমকানিতে রহিম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

নাটকটির ঘটনাকাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। যুদ্ধের একটা আবহ নাটকটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অবশ্য তখনও গ্রামের মানুষকে যুদ্ধ গ্রাস করতে পারেনি। উৎসব অনুষ্ঠান তখনও চলছে। গোবিন্দ কালীপূজার মিছিলে সঙ সাজে জাম্বুবানের। সে কবিতা রচনা করে। কবিতায় ফুটে ওঠে জরাজীর্ণ, দৈন্যভারাক্রান্ত গ্রামজীবনের ছবি। কালীকে স্মরণ করে গোবিন্দের ভাষা কেঁদে লুটিয়ে পড়ে 'পথ্য পাচন দাও নাই ভাই দুঃখ বলি কাকে / মরিয়া জুড়াই কেউ বা বাঁচিয়া মরিয়া থাকে।।' শক্তির বন্দনার সময় এইসব দুর্বল চাষি বলে 'পূজা নমাজ কতয় কবি আসান পাওয়ার আশে / অন্তরের মালিক অন্তরালে বসি হাসে।। / শহিহীনের ভক্তিতে ভাই তুষ্ট হয় না কাঁয়ো।' গোবিন্দের গানে হিন্দুর উৎসবে মুসলমানের যোগদানের ঘটনাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাটক যত এগোতে থাকে গ্রামের যৌথভাগ, যৌথ মিলনের পরিবেশটি তত ঘন হতে থাকে। তুলসীদাস এই দিকটিতে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ রেখেছিলেন। নাটকটির রচনার সময় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কথা নাট্যকার স্মরণে রেখেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর রহিমুদ্দির কবিতায় ফুটে উঠতে থাকে আল্লার বিচারের প্রতি ভক্তি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভও। সে যেন স্বপ্নে দেখতে পায় কিয়ামতের বিচার সভা। সে বলে 'চেনা জানা দেইখনো মেলাই নাম করি কি ফল / ওই হাকিমুদ্দিক্ দেখিয়া মোর বুকে আইল বল / উয়ার যদি মাফি হয় মোর কোনর ডর নাই— / দয়ার সাগর রসুল হামার।' এদিকে হাকিমুদ্দি গ্রামের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। সরকারি আমলাতন্ত্রের খাতির করে, খাতির পায়। জাপান যুদ্ধে এগিয়ে আসছে। অতএব যুদ্ধের প্রয়োজনেই টাকার প্রয়োজন। সেই চাঁদা তুলতে নির্দেশ দেয়। অভাবগ্রস্ত প্রজারা প্রমাদ গোনে।

আর রহিমুদ্দির বাড়িতে তখন খুশির জোয়ার। রহিম শহর ঘুরে এসেছে। স্ত্রীর জন্য জুতো কিনেছে। মহিম এস্রাজ দিয়েছে। শহরের অগ্রগতি রহিমকে মুগ্ধ করেছে। ছেলেকে শহরের কথা বলে, স্ত্রীকে শহরের হাওয়াই জাহাজ দেখার কথা বলে তাক লাগিয়ে দেয়। কে জানে রহিমের কথার মধ্য দিয়ে তার ছেলেবেলার স্বপ্ন জেগে ওঠে কিনা। সে দেখে শহরের মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষও পারত, যদি না সে ভয় পুষে রাখত। শহরের মানুষ *'নৌতন কিছু দেইখলে তারা শিক্ষা করি নেয়। আর হামরা আউগাইবারে চাই না।'* দাম্পত্য প্রণয়ের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র নাট্যকার এখানে উপহার দিয়েছেন। তাদের কথায় জানা যায় রহিমের বিপদের দিনে বিবি ফুলজান ছিল বলেই রহিম সাহস পেয়েছে, এগিয়েছে। শহরের শিক্ষাই তো এই। স্ত্রী-পুরুষ সমানভাবে এগোলেই অভীষ্ট লাভ নিশ্চিত। নাট্যকার কি এখানে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন ? এই দাম্পত্য আলাপে গোবিন্দ এসে খবর দেয় *'হাকিমুদ্দি কইলে হুজুর রহিমুদ্দি পাঁচ কুড়ি টাকা খরচ করিয়া, বাজা-টাজা হাবিজাবি, কিবা-কিবা সব কিনিছে, উয়ার এক কুড়ি টাকা চাঁদা ধরা হউক।'* বোঝা যায়, হাকিমুদ্দি তার ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রহিমুদ্দিকে শনাক্ত করেছে। বলা বাহুল্য, এও এক ধরনের রাজনীতি। অর্থাৎ গ্রামশাসনে, গ্রাম্য অধিকার নিয়ন্ত্রণে হাকিমুদ্দির উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার পথে

Scanned by CamScanner

বাধা রহিমুদ্দিন। হাকিমুদ্দির বাড়িতে চুরি হয়ে যায়। আসলে নৌকায় ডাকাতি হয়। নৌকাতে বোঝাই ছিল হাকিমুদ্দির বেচে দেওয়া চাল আর খাদ্যসম্ভার। হাকিমুদ্দি হয়তো এই চুরির জন্য দায়ি করবে রহিমুদ্দিকেই। তার সঙ্গে জড়িয়ে দেবে গ্রামবাসীকেও। এখন তার হাতে ক্ষমতা। নাটকটি যে অঞ্চলকে ঘিরে গড়ে উঠেছে সে অঞ্চলে সুদখোর মহাজন এবং জমিদার প্রজাশোষণে কুৎসিত কৌশল গ্রহণ করেছিল। যার ফলে প্রজা সমিতি পরে কৃষক প্রজা সমিতি রূপে জন্ম নেয়।

রহিম-গোবিন্দরা বুঝতে পারে না দুজনের পরিশ্রম একজন করেও যেখানে সাধারণ কৃষক দুবেলা খেতে পায় না, সেখানে হাকিমুদ্দির এত টাকা কোথা থেকে আসে ? নিশ্চয়ই *'উয়ার টাকা ভাই অন্ধকারে আইসে যায় ; আলোৎ চলে না।'* গান-পাগল গোবিন্দ রহিমুদ্দিকে তার দিলবুবা ঠিকঠাক করে রাখতে বলে। ভাসানের সময় ভালো আসর জমবে। নাট্যকার দিলবুবাকে নাটকের প্রতীকী তাৎপর্য দিতে চেয়েছেন। সেজন্যেই এই প্রসঙ্গ। হারমোনিয়াম কেনার কথাও এই সূত্রে এসে যায়। গানবাজনার বিষয়টি এই নাটকটিকে ঘিরে থাকে। এর সঙ্গে সমাজ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ জড়িয়ে থাকে।

হাকিম দারোগা পুলিশ নিয়ে রহিমুদ্দির বাড়িতে ঢুকে যায়। সব দেখে শুনে দারোগা হতাশ। কোথাও চুরির মাল নেই। অবশেষে রহিমুদ্দির মা-র ঘর থেকে বের হয় এক পোঁটলা কাগজ। হাকিমুদ্দির চাকর কুক্‌রা এই বান্ডিল ওই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। হয়তো এই সূত্র থেকেই রহিমুদ্দিকে চোর সাব্যস্ত করবার কলকাঠি পাওয়া যাবে। কিন্তু রহিম আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়। আর বলে *'ইমান ঠিক্ থাকলে কোন দিন হাইর হয়ে না।'* মা-কে আশ্বাস দেয়। *'কোনও ডর নাই মাও, ইমান মোর ঠিক আছে।'* লক্ষণীয়, রহিমের এই 'ইমান'-আশ্রয়—তুলসীদাসের *'দুঃখীর ইমান'*-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের।

বিচারে কুক্‌রার জেল হয়েছিল। *'দুঃখীর ইমান'*-এর মতো এখানেও তুলসীদাসের বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা দেখা যায়। *'দুঃখীর ইমান'*-এ যেমন তুলসীদাসের প্রতি নাট্যসমালোচকবৃন্দ কঠোর হয়েছিলেন নাট্যকারের আমলাতন্ত্রের প্রতি 'পক্ষপাতে'র জন্য, *'ছেঁড়া তার'*-এ সেরকম সমালোচিত না হলেও বিষয়টি কিন্তু একই। এ কি নাট্যকারের কোনো অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ? কে জানে ?

যাই হোক ধীরে ধীরে গ্রামে আকাল ঘনিয়ে এল। হাকিমুদ্দির গোলাভরা ধান। তার কাছে ধান ঋণ নেওয়ার জন্য চাষিরা আসবে অথবা লুঠ করবে ধান। হাকিমুদ্দি বুঝতে পেরেছিল গ্রামে চাষিরা জোট বাঁধছে। হাকিমুদ্দি কিছু ধান সরিয়ে ফেলতে চায়। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে এই ধান সরকার নিয়ে নিতে পারে বাজারের চেয়ে অনেক কম দামে। হাকিমুদ্দি কেমন যেন দিশেহারা হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে হাকিমুদ্দি সুদে ধান কর্জ দিতে রাজি হন। গোবিন্দ প্রমুখ যারা ধানের জন্য এসেছিল তাদের আকালে কী অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছে তার সংবাদও নাট্যকার তুলে আনেন। একদিকে অভাব অনটন অন্যদিকে মড়ক। এ দুইয়ে মিলে পিষ্ট চাষির করুণ চিত্র নাট্যকার দেখিয়ে দেন দর্শককে।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে নাট্যকার জানাচ্ছেন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস গোটা বাংলাদেশের মানুষকে নানিয়ে এনেছে পশুর দলে। চাষিরা বৃত্তি-রোজগারহীন। চাষি মজুর বেকার। সাধারণ কৃষকও দুর্ভিক্ষের শিকার। সরকার ধনীর ধান নিজের গোলায় তুলে নিয়েছে। নেতারা জেলে (বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন)। মধ্যবিত্ত কিছু মানুষের চিত্রচরিত্র পালটে গেল। যুদ্ধের দৌলতে সেনাবিভাগে কেউ কেউ যোগ দিল, কেউ কেউ মাল জোগান দিয়ে ফেঁপে ফুলে উঠল।

এই অবস্থায় গ্রামের মানুষ এক জোট হয়ে রহিমুদ্দিনের পরামর্শের জন্য মিলিত হয়। রহিমুদ্দিনের হতদশা। রোগে তাকে আধমরা করে ফেলেছে। জমিজমা হাকিমুদ্দির 'প্যাটে' চলে গেছে। মা মরে গেছে। অভাব রহিমুদ্দিনকেও তাড়া করেছে। হাকিমুদ্দির মা রহিমুদ্দিনের মা-কে পরিচারিকার কাজ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমানের দিকে তাকিয়ে রহিমের মা সে কাজ নেয়নি। এত অভাব সত্ত্বেও রহিম হাকিমুদ্দির কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যায়নি। গ্রামের মানুষ এখন দিশেহারা। লঙ্গরখানার কথা তারা শুনেছে। সরকারের কাছে আবেদন করবে কিনা তারা বুঝে উঠতে পারছে না, নাকি রহিমুদ্দির কাছে যাবে সে কথাও তারা ভাবছিল। কিন্তু সকলেই যেন চাইছিল ধনীর গোলায় যেটুকু ধান অবশিষ্ট আছে তা লুঠ করতে। বলা বাহুল্য, রহিমুদ্দি বুঝিয়ে দিল লুঠপাটে কিছুদিন চলবে হয়তো, কিন্তু তারপর ? রহিমুদ্দিনকে মেনে নিল চাষিরা। দ্বিতীয় অঙ্ক থেকেই রহিমুদ্দিনকে নাটকের নায়ক রূপে দেখা যায়। রহিমুদ্দিনের বিকাশে লক্ষ করি একজন মার্জিত চাষির চেহারা। যে হাকিমের কাছে সওয়াল করে, লেখাপড়া জানে, ফুলের বাগানে মনকে মেলে দিতে পারে। ফুলজান, ছেলে বছির এবং মাকে নিয়ে প্রায় একটি মধ্যবিত্তের রুচিতে গড়া রহিমের পরিবার। চরম দুর্দিনেও রহিমুদ্দিন নীতিবোধ জাগ্রত রাখে। আবার হাকিমুদ্দির নষ্টামি, বজ্জাতিকে সে শুধু ঘৃণাই করে না, কোনো অবস্থাতেই সে আপোস করতে পারে না হাকিমুদ্দিনের সঙ্গে। নাট্যকার একদিকে দেখাচ্ছেন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত জোটবাঁধা গ্রামবাসীকে, অন্যদিকে রহিমের মধ্যবিত্তসুলভ নেতৃত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র *'আনন্দমঠ'* উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন অবস্থাবিশেষে মানুষ পশুমাত্র। জোটবাঁধা কিষাণের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে রহিমুদ্দিন কিন্তু মানুষের পশুশক্তি নয়, মনুষ্যশক্তিরই জয় দেখাতে চাইছেন। আর প্রতিনায়ক এই জায়গাটায় ধাক্কা দিয়ে বারবার জিতে গিয়েছে। রহিমুদ্দির সিদ্ধান্তের কথা শুনে হাকিমুদ্দি নিশ্চিন্ত হয়। রহিমুদ্দিন স্ত্রী আর ছেলেকে ফুলজানের ফুফুর বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চায়। তারা অন্তত দুদিন খেয়েপরে বেঁচে থাকুক। হতাশ ফুলজানরা ফিরে আসে। এদিকে মানুষ ঘরের ছেলে বউ বেচে দিচ্ছে। মিলিটারির জন্য যুবতী স্ত্রী-র প্রয়োজন। গরু, ছাগল আগেই বেচা হয়ে গেছে। এরই মধ্যে গোবিন্দ গান বাঁধে *'না খাওয়া ফুটকাটা তার ফুট্‌কীক্ ডাকি কয় / প্যাট না থাকিলেরে সুখী হইল হয়। / হাত পা ও চৌউক কান দুইটা করি / প্যাট একটা হয় / (ফির) এমনি করি থুইছেরে দ্যাহে কাটি ফ্যালার নয় / রে ভাই কাটি ফ্যালার নয়।'* মঞ্চে এই গান নিশ্চয়ই করুণ আবহের সৃষ্টি করেছিল। রহিমুদ্দিন দিলবুবা নামায়। টুং টাং শব্দও করে। কিন্তু বাজাতে পারে না।

Scanned by CamScanner

হাকিমুদ্দি তার চার বিবি নিয়ে সুখেই আছে। কিন্তু নারীলোলুপ হাকিমুদ্দি ফুলজানকে বাঁদিরূপে ঘরে তুলতে চায়। প্রস্তাবও সে দিয়েছে। এখানে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি রহিমুদ্দিন। ফুলজান বাঁদি হলে রহিমুদ্দিনের মান থাকে কোথায় ? শেষ পর্যন্ত বছিরের দিকে তাকিয়ে রহিম ফুলজানকে লশ্করখানায় জোর করে পাঠিয়ে দেয়। আর সে আর্তনাদ করে ওঠে *'উঃ ! মোক হাইর মানাইলেরে ? সবাই মিলি মোক হাইর মানাইলে'*—শ্রীমন্তের সঙ্গে কথাবার্তায় ধর্মে বিশ্বাসী দুজনেই ধর্মের প্রতি সংশয় প্রকাশ করে। শ্রীমন্ত এত দুঃখেও ভগবানের দোহাই দেয়। রহিম খেপে ওঠে। *'কেউ আল্লা কেউ হরি বলি, কেউ নমাজ কেউ পূজা করি, দুনিয়ার মালিকের কাছে মাথা নীচা করি থাইক্‌ছে। আইজ মাইনষেরও পরীক্ষা আর মালিকেরও পরীক্ষা, বিশ্বাস ধরি থাইক্‌লে শয়তানগুলার সাথে পাইরবার নইস।'* প্রকৃত সংগ্রামের উৎস এই সংলাপ। আমরা কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করি রহিমুদ্দিনের নীতিশাসন যখন মানুষের ফেটে-পড়া বিদ্রোহকে যথার্থ সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে দেয়। শ্রীমন্ত কিছু চিঁড়ে দিয়েছিল, তাই খেয়ে সে খিদে মেটাল। হাকিমুদ্দির লশ্করখানায় সে যেতে পারে না। অথচ হাকিমুদ্দি যে সরকারি সাহায্যেই এই লশ্করখানা খুলেছে শ্রীমন্ত বোঝালেও রহিমুদ্দি তা বুঝতে চায় না। রহিমুদ্দিনের প্রতিবাদী চেহারাটি কেমন যেন ফিকে হয়ে যায়। ফিরে এল বছির ফুলজান। লশ্করখানায় তারা খানা পায়নি। তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। আর রহিমুদ্দিন এইমাত্র শ্রীমন্তের দেওয়া চিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। বাপের বুক ফেটে যাচ্ছে তখন। হাকিমুদ্দি বছির ফুলজানকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যারা ট্যাক্স দেয় তারা লশ্করখানায় খাবার পাবে না। দিগ্‌ভ্রান্ত রহিমুদ্দিন তখন সাময়িকভাবে বিবেচনা হারিয়ে ফেলল। সে ফুলজানকে তালাক দিয়ে দিল। আমরা বুঝতে পারি নাটকটির ক্লাইম্যাক্স এইখানে। একটি সংগ্রামী জীবনের ব্যর্থতা। রহিম ভেবে নিয়েছিল শরিয়তি নিয়ম মানলেই তার স্ত্রী আর ট্যাক্সের আওতায় থাকবে না। রহিমুদ্দিনের ব্যক্তিগত মান-অভিমানই এখানে প্রধান হয়ে উঠল, *'খাওয়াবার পারি নাই। কিন্তু মোরে তার জন্য তোর খাওয়া বন্ধ হচ্ছিল। তাতে তোক্ ফারকৎ করি দেনো।'* রহিমুদ্দিন অবশ্য এই বলে সান্ত্বনা দিল যে এটা তার বাঁচার কৌশল মাত্র। দুমাস পরে সে বছিরকে নিয়ে ফিরবে। ফুলজানের হাতেই বছিরকে তুলে দেবে। এটা বুঝতে পারলে না কঠোর শরিয়তি শাসন থেকে রহিমুদ্দির মুক্তির নেই। দিলবুবা পড়ে থাকে। ওটা যে ফুলজান তুলে রাখবে এখন সে অধিকার থেকেও বঞ্চিত। এই বিচ্ছেদ আর এক দিক থেকে নাটকটির মর্মকে স্পর্শ করে আছে। এ পৃথিবীতে ন্যায়, সত্য, ইমান টিকিয়ে রাখা কঠিন। শাসক আর শোষিতের দ্বন্দ্বে শোষিত কদাচিৎ জেতে। একজোট চাষির চলাকেও রহিমুদ্দিন যথার্থ পথে চালিত করতে পারেনি। ব্যক্তির আত্মত্যাগের দ্বারা সমাজে আদর্শ স্থাপন করা যায় বটে, কিন্তু সমাজ যে তাতে খুব বেশি অগ্রসর হয়ে যায়—এমন নয়। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আমরা রহিমুদ্দিনের বন্ধু মহিমকে পাই। ঘটনাস্থল কলকাতা শহর। মহিম, মহিমের বন্ধু সুশান্ত দেশের অবস্থা, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ পরিস্থিতির আলোচনা করছিল। রহিম এখানেই ফার্মে কাজ করে। বছির অসুস্থ। চার মাস কলকাতায় আছে রহিমুদ্দিন। বছির মা-র কথা ভেবে ভেবে

অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রহিমুদ্দিন সাহস সঞ্চয় করতে পারে না দেশে ফেরার। ফুলজানের কাছে সে অপরাধী। সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার কোনো রাস্তা খোলা নেই তার সামনে। রহিম ধর্মপ্রাণ মুসলমান। সে শরিয়তের বিধান মানে। যদি কোনো মুসলমান ফুলজানকে বিয়ে করে তালাক দেয় তবেই রহিমুদ্দিন ফুলজানকে আবার বিবাহ করতে পারে। এটা প্রায় অসম্ভব। কেননা বিনা কারণে তালাক দেওয়া সম্ভব নয়। ফুলজান হাকিমুদ্দির বাড়িতে বাঁদিই থেকে যাবে। এ যন্ত্রণা রহিমুদ্দিনকে পিষে ফেলতে লাগল। তবু সে বছিরের কথা ভেবে গ্রামে ফিরবে ঠিক করে নিল।

বস্তুত দুর্ভিক্ষের শেষে যারা বেঁচে ছিল তারা আবার গ্রামেই ফিরতে লাগল। শ্রীমন্ত, গোবিন্দ ফিরে এসেছে। কলকাতার পরিবেশ তারা জেনেছে। সেখানেও লোভ আর 'ইয়ারটা অ্যয় চুরি করে, উয়ারটা এ্যাঁয় চুরি করে।' কলকাতার পরিবেশের সঙ্গে গোবিন্দ শ্রীমন্তের খাপ খাওয়ানো কঠিন। কলকাতাতেই গোবিন্দ নতুন গান শিখেছে। যে গান গেয়ে গোবিন্দ বেশ আরামে দিন কাটিয়েছে এমনকী কিছু জমাতেও পেরেছে। তুলসীদাস সে গান দর্শকদের শুনিয়ে দেন *'ভুল না রেখ মনে; বাঁচবে যতকাল/ সোনার দেশে ক্যান এল পঞ্চাশের আকাল.....।'* এই গানে ফুটে উঠেছে সমকালীন সমাজ। এই গানেই শোষককে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে, এ গানে আছে নিম্নবর্গীয় মানুষের জাগরণের ভাষা।

রহিমুদ্দিন ফিরে আসে। সঙ্গে রোগাক্রান্ত বছির। সবাই খুশি হয়। মহুরা রহিমুদ্দিনের দেখাশোনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কৃষকদের মধ্যে আন্তরিকতা, আত্মীয়তার এবং অকৃত্রিম ভালোবাসার চিত্রটিও নাট্যকার এঁকেছেন এই নাটকে। রহিম আসবে শুনে তার ঘরদোর পরিষ্কার করে, তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখে। দারুণ আকালে শ্রীমন্ত রহিমের জন্য চিঁড়ে নিয়ে আসে। ছোটোখাটো এই নজিরগুলি মাধ্যমে গ্রামের সম্মিলিত জীবনের প্রতিফলন ঘটাতে ঘটাতে নাট্যক্রিয়া এগিয়ে যায়।

কৃতজ্ঞ রহিমুদ্দিন গ্রামের চাষিদের প্রতি। সে ধুলায় মাখা দিলবুবা নামিয়ে আনে। মা-কে দেখার জন্য বছির ব্যাকুল। রহিমুদ্দিনও ফুলজানকে পাওয়ার জন্য কাতর। এক ফকিরের সঙ্গে বিয়ে এবং তালাক করিয়ে ফুলজানকে রহিমুদ্দিন ফিরিয়ে আনতে চায়। ফুলজান তার সম্মতি জানিয়েছে ফুফার মারফৎ। হাকিমুদ্দি বেঁকে বসে। ফকিরকে সে কুক্ষিগত করতে চায়। অর্থলোভী পিশাচ ফকির সাত-পাঁচ ভাবে। গ্রামের মানুষ রহিমুদ্দিনের পক্ষে। দেশের ইমাম কানা ফকিরের সঙ্গে ফুলজানের বিয়ের কাজ করবে না জানিয়ে দেয়। সরেমামুদ দশশিলার ইমামকে রাজি করায়। এদের কথাবার্তার সময় বছিরের করুণ আর্তস্বর ভেসে আসে *'ঐ যে মাও'*। রহিমুদ্দিন সান্ত্বনা দেয়। ফুলজান ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে গোপনে ছেলেকে দেখার চেষ্টা করে। গ্রামের মানুষই বছিরের জন্য ডাক্তার নিয়ে আসে। সমস্ত পরিবেশটি বিপদঘন হয়ে ওঠে।

হাকিমুদ্দি আসে। ফকিরকে শাসায়। রহিমুদ্দিনকে শরিয়তের নজির দেখিয়ে হুমকি দেয়। ফুলজানকে জোর করে আনলে হদীজ খেলাপ হবে। উত্তরে রহিমুদ্দিন বলে, *'তোমার হদীজ ধরি তুমি বেহেস্তে যান্ মুই খেলাপ করি জাহান্নমে যামো।'*

Scanned by CamScanner

রহিমুদ্দিন খেপে ওঠে। সন্তানের আর্ত মুখ তাকে মরিয়া করে তোলে। সে ছুটে যায় হাকিমুদ্দির বাড়ি। ফুলজান মৃদু প্রতিবাদ করে ধর্মের নামে। রহিমুদ্দিন নিজ প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে। ফুলজানের কোলে বছিরকে এনে দেবে। প্রতিজ্ঞা পালন সে করবেই। ফুলজানকে নিয়ে আসে নিজের বাড়িতে। সঙ্গে তার হয়ে লড়াই করছে আর হাকিমুদ্দি-বিরোধী গ্রামের অধিকাংশ চাষি। বছির মা-র কোলে ফিরে যায়। ফুলজান ছেলেকে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে। এখানে দেখতে পাই রহিমুদ্দিনের হৃদয়ছেঁড়া আর্তনাদ *'নিকার নামে বেইজ্জৎ হইলে হদীজ খেলাপ হয় না। ছাওয়াটাকে বাঁদীর বাচ্চা বানাইলে হদীজ খেলাপ হয় না। যে মানুষটা একটা মুখের কথা থাকি বাঁচে, তার জীউটা দুই পায়ে থেৎলাইলে হদীজ খেলাপ হয় না—না ?'* নাট্যকার ছুঁড়ে দেন দর্শকের প্রতি এই তীক্ষ্ণ বাণ। রহিমুদ্দিনের দিলরুবার তার হঠাৎ ছিঁড়ে যায়। রহিমুদ্দিন ঘরে ঢুকে পড়ে। হাকিমুদ্দিকে ধরে নিয়ে আসে চাষিরা। তার বিচার চায় তারা। এমন সময় রহিমুদ্দিনের খোঁজে শ্রীমন্ত ঘরের দরজা খুলে দেখতে পেল রহিম গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সমবেত চাষির কণ্ঠে হাকিমুদ্দির শাস্তিবিধানের শপথের ধ্বনি গর্জে ওঠে। বিহ্বল ফুলজান কেবল বলে চলে রহিমুদ্দিনের শোকতাপ এতদিনে জুড়িয়ে গেল। সত্যিই জুড়োল ? নাট্যকারের জিজ্ঞাসা—এর উত্তর কীভাবে, কী ভাষায়, কেমন করে সর্বশক্তিমান শোনাবেন—জগৎ আজ তাই জানবার জন্য উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। সর্বশক্তিমান বলতে নাট্যকার কি ঈশ্বর বা আল্লাকে নির্দেশ করছেন ? নাকি সমবেত কৃষক-শক্তিকে বুঝিয়েছেন ? এই প্রশ্নে দর্শক আক্রান্ত হয়। তুলসীদাসের মানসিকতা এই রচনায় সুস্পষ্ট। নিম্নবর্গীয় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি তুলে ধরেছেন এই নাটকে, শোষণের আগ্রাসন নাট্যকারকে বিচলিত করেছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু আদর্শবাদী রহিমুদ্দিনের চরিত্রের সংলাপে কখনও কখনও কৃত্রিমতার স্পর্শ পাই। মহিম-সুশান্ত দৃশ্যও অযথা দীর্ঘ বলে মনে হয়। নাটকটির গঠনে নাট্যকারের প্রয়াস কৃতিত্বের দাবি করতে পারে নিশ্চয়ই। কিন্তু একান্ত সরলরৈখিক কলাকৌশল গৃহীত হয়েছে বলে নাটকটি সাধারণ সাদামাঠা পর্যায় থেকে অভিনব কোনো শৈলীতে পৌঁছোতে পারেনি।

'ছেঁড়া তার'। প্রথম অভিনয় রজনী—বহুরূপী নাট্য সংস্থা আয়োজিত প্রথম নাট্যোৎসবের (পশ্চিমবঙ্গের এই প্রথম নাট্যোৎসব) তৃতীয় দিনে (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৫০, সকাল দশটায়)। মঞ্চ নিউ এম্পায়ার। প্রথম রজনী ও পরবর্তীকালের অভিনেতা ও অভিনেত্রী :

মহিম	—	দেবব্রত বিশ্বাস / শান্তি দাস
রহিম	—	শম্ভু মিত্র
হাকিমুদ্দি	—	তুলসী লাহিড়ী / গঙ্গাপদ বসু
কুকড়া ও শিয়াশু	—	গঙ্গাপদ বসু / কুমার রায়
প্রেসিডেন্ট	—	মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য / দেবতোষ ঘোষ
শ্রীমন্ত	—	মহম্মদ ইসরাইল / অরুণ মুখার্জি
সরেমামুদ	—	অমর গাঙ্গুলি / অনিল ব্যানার্জি

গোবিন্দ	—	সবিতাব্রত দত্ত / শোভেন মজুমদার
মামুদ	—	শোভেন মজুমদার / বলাই গুপ্ত
কানা ফকির	—	পারিজাত বসু / অমর গাঙ্গুলি
দারোগা	—	নির্মল চ্যাটার্জি / কালিপ্রসাদ ঘোষ
ফুলজান	—	তৃপ্তি মিত্র

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত, কার্তিক, ১৩৫৯ ; দ্বিতীয় প্রকাশ ভাদ্র, ১৩৬১। দ্বিতীয় প্রকাশের বক্তব্য—

> নাট্যরসিকবর্গের প্রশংসাধন্য এই নাটকটির প্রথম সংস্করণ নিতান্ত দৈন্যের মধ্যেই প্রকাশ করা হয়। তারপর এদেশের কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষায় এর অনুবাদ হওয়ায় এবং বিদেশেও প্রশংসা পাওয়ায়, একে আমার পক্ষ থেকে যথাযোগ্যভাবে প্রকাশ করা উচিত মনে করে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল। এখন পাঠকবর্গের মনস্তুষ্টি হলেই শ্রম সার্থক হয়। ইতি আগস্ট ১৯৫৪। নাট্যকার শ্রীতুলসীদাস লাহিড়ী। দ্বিতীয় প্রকাশ ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

পথিক

কোনো এক সময়ে তুলসীদাস দুর্গাপুর অঞ্চলে বাস করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি কোলিয়ারির শ্রমিকজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সন্দেহ নেই। *'পথিক'* নাটকের ঘটনাস্থল বাংলা-বিহার সীমান্ত। কয়লাখনি সেখানে প্রচুর। ব্যক্তিগত মালিকানায় এই খনিগুলি থেকে কয়লা তোলা হত। বেশ কিছু বাঙালি এই খনির মালিক ছিলেন। মালিক প্রায় জমিদারি কায়দায় এই সোনার খনির নিয়ন্ত্রণ করতেন। মজুররা কৃষক প্রজার মতোই শোষিত হত মালিকের স্বেচ্ছাচারিতায়।

যশপাল এখানেই একান্ত নিরালায় হাইওয়ের ধারে একটি চায়ের দোকান করেছে। পাঁচপাঁচি এই দোকানে চা-বিস্কুট সস্তার নাস্তা পাওয়া যেত। আসা-যাওয়ার পথে শ্রমিক, খনির মধ্যবিত্ত কেরানি এমনকী উচ্চপদস্থ কর্মচারীও যশপালের দোকানে চা খেয়ে যেত। দোকানের কাছাকাছি কোনো বসতি ছিল না। এই নির্জন স্থানে দোকানে বসে চা খেতে খেতে শ্রমিকরা নিজেদের সুখদুঃখের গল্প করত। যশপালের সঙ্গে কিছু গল্পগুজবও করত। যশপাল ব্যাবসার খাতিরেই খদ্দেরকে সমীহ করে চলত।

এই দোকানের সঙ্গেই অন্তঃপুরে থাকে সুমিত্রা, সুদর্শন, বুধনী। সুমিত্রার ঠাকুরদা যশপালের ভাই। ঠাকুরদা কোলিয়ারি কিনেছিল। কিন্তু লোকসান দিয়ে শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হয়। ঠাকুরদার ছেলে সুদর্শন, সুদর্শনের মেয়ে সুমিত্রা। সুদর্শন মদ্যপ, খেয়ালি, উচ্ছৃঙ্খল। জীবনে উন্নতির চেষ্টা সে করেছে, কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। যশপাল এদের দুজনকেই ভালোবাসে। বিশেষত সুমিত্রার প্রতি তার মমতা বাপের মতোই। সুমিত্রা মিশনারি স্কুলে পড়েছে। ইংরেজি ভালোই জানে। আর বাংলা সাহিত্যে তার রুচি। তার কথাবার্তায় আচার-আচরণে মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের মেয়ের ছাপ। প্রয়োজনে দোকানের কাজকর্মেও সাহায্য করে। সে যশপালকে শ্রদ্ধা করে। যশপাল তাকে আশ্রয় দিয়েছে বলে

Scanned by CamScanner